ধর্মতলার মোড়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক সমাবেশে সেদিনকার জ্যোতি বসু

কলকাতার আন্দোলন

দেবাশিস ভট্টাচার্য

(ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক ও ভাষ্যকার)

কখনও মনে হয় কলকাতা আছে কলকাতাতেই। আবার কখনও মনে হয় কলকাতা নেই কলকাতাতেই। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে জওহরলাল নেহেরু আন্দোলনে উত্তাল কলকাতা দেখে বলেছিলেন মিছিল নগরী কলকাতা। আবার ১৯৮৫ সালে নেহেরুজির দৌহিত্র রাজীব গান্ধী কলকাতা পুরসভা ভোটের মুখে বলেছিলেন ক্যালকাটা ইজ এ ডাইং সিটি। প্রধানমন্ত্রী হলেও রাজীব গান্ধী তখন কংগ্রেসের সভাপতি। পুরভোটের আগে কলকাতায় ভোগবিলাসী উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের ভোট পাওয়ার জন্যই রাজীব গান্ধী ওকথা বলেছিলেন। আবার তাঁর মাতামহ যে চিন্তায় মিছিল নগরী কলকাতা বলেছিলেন সেই চিন্তা বিচার বিশ্লেষণ করলে ১৯৮৫ সালে কলকাতা অনেকটা নিষ্প্রভ ছিল। কারণ তখন কলকাতায় আন্দোলন ছিল না। সে বছরেই ওই সময় বামফ্রন্ট সরকার হলদিয়া পেট্রো কেমিকেল্স প্রকল্পে বেসরকারি মালিকের সঙ্গে যৌথভাবে শিল্প গড়ার লাইন নেয়। জ্যোতি বসু ছিলেন সেই লাইনের প্রবক্তা। সে বছরের

নভেম্বরে টালিগঞ্জে অনুষ্ঠিত সি. পি. আই. এমের রাজ্য সম্মেলনে বামফ্রন্ট সরকারের জয়েন্ট সেক্টর শিল্পনীতি নিয়ে বিতর্ক ওঠে। উত্তর ২৪ পরগণার শ্রমিক নেতা প্রয়াত যামিনী সাহা সহ বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি বিরোধীতা করেছিলেন। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে আয়োজিত সি.পি.আই. এমের দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে এই নিয়ে কথা হয়। কিন্তু জ্যোতি বসু তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে বামপন্থা থেকে বিচ্যুত একটি রাজনৈতিক লাইন (শিল্পায়নে জয়েন্ট সেক্টরের প্রস্তাব) অনুমোদন করিয়ে নেন। মুজফ্‌ফর আহমেদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার বেঁচে থাকলে জ্যোতি বসু সেদিন সফল হতেন কী না সন্দেহ আছে। পাঠক বলবেন, এ সব কী বলছেন। হ্যাঁ, ব্যক্তিত্বের জোরে এবং ১৯৮৫ সালে সি. পি. আই.এমে তেমন প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতিতে ভুল লাইন পাশ হয়।

১৯৯৬ সালের ১৩ এবং ১৪ মে সি. পি.আই.এমের কেন্দ্রীয় কমিটি জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য ভি. পি. সিং, মুলায়ম সিং যাদব, লালুপ্রসাদ সহ বিরোধী নেতাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারী 'এশিয়ান এজ' পত্রিকায় প্রকাশিত এম. জে. আকবরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতি বসু দলের ওই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে ঐতিহাসিক ভুল বলেছিলেন। তার ২৭ দিন পর কলকাতা বইমেলায় সুরভী ব্যানার্জির লেখা 'জ্যোতি বসু' বইটি জ্যোতিবাবু উদ্বোধন করেন। সেখানে ওই ঐতিহাসিক ভুলের কারণ হিসেবে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিকাংশ নেতা রাজনৈতিকভাবে পরিণত নন।' নৃপেন চক্রবর্তীকে দল বহিষ্কার করতে পেরেছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে ওইসব কথা বলা সত্ত্বেও জ্যোতি বসুকে বিন্দুমাত্র শাস্তি, একদিনের জন্য সাসপেন্ড অথবা দলীয় গঠণতন্ত্র অনুযায়ী দলের মধ্যেও তিরস্কার করা হয়নি। জ্যোতি বসুর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে অন্যেরা বামুন হয়ে গেছেন। আজ সি. পি. আই. এমের এই হাল হওয়ার পেছনে অন্য অনেক কারণের সঙ্গে জ্যোতি বসুর বামপন্থা থেকে সরে আসা লাইনের সঙ্গে অন্যদের বামুন হয়ে যাওয়াও অন্যতম কারণ।

সি.পি.আই.এম. দল ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মানত যে সি.পি.আইয়ের জন্ম ১৯২৫ সালে। ১৯২৫ সালে কানপুরে সভ্যভক্তর ডাকা দেশের সব কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর বৈঠক থেকেই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু ১৯৭০ সালে সি.পি.আই.এম কেন্দ্রীয় কমিটি বলে ভারতের কডিনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর। ওইদিন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার তাসখন্দে বসে কয়েকজন ভারতীয় কমিউনিস্ট মিলে যে বৈঠক করেন সেখান থেকেই সি.পি.আইয়ের যাত্রা শুরু হয়।

১৯২০ দশকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কতিপয় কমিউনিস্ট কাজ করছিলেন। যেহেতু ১০০ বছর আগের কথা, তাই

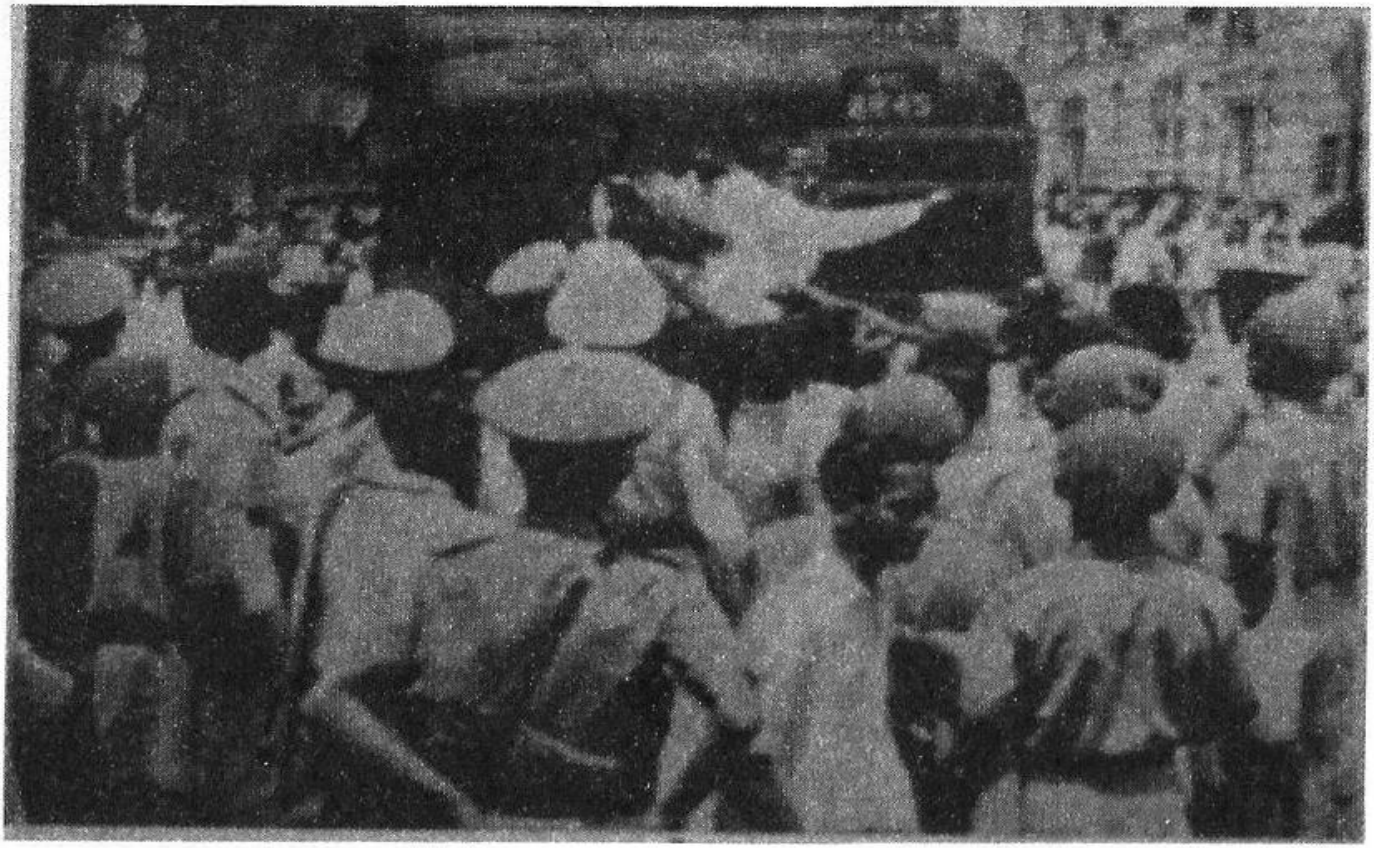

সেদিন ব্যাঙ্কসাল কোর্টের সামনে খাদ্য আন্দোলনকারীরা

এঁদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে এক নম্বর ছিলেন মুজাফফর আহমেদ, আত্মগোপনকালে যাঁর নাম হয় কাকাবাবু। ছিলেন সোমনাথ লাহিড়ি, রনেন সেন, আব্দুল হালিন, রোজ্জাক খান প্রমুখ ব্যক্তিরা। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার বিপ্লব হয়, সেই বিপ্লব দেখে ওইসব কমিউনিস্টরা উৎসাহিত হন। তখন বিদেশ থেকে জাহাজে লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু মার্কসবাদী বইপত্র আনা হত।

১৯২০-২১ সাল থেকে কমিউনিস্টরা কলকাতায় কাজ শুরু করেন। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ, শোষণ নিষ্পেষণ। অত্যাচার থেকে গরিবদের মুক্ত করার মতবাদ। শ্রমিকশ্রেণীর মতবাদ সেখানেই জোরদার হবে যেখানে শ্রমিক শ্রেণী আছেন। ইংরেজ আমলে উত্তরবঙ্গে চা বাগান শুরু হয়। তাছাড়া শিলিগুড়ি থেকে কল্যাণী পর্যন্ত সে সময় তেমন কোনও শিল্প ছিল না। ওদিকে বর্ধমানের আসানসোল রানীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল ছিল। তখন দুর্গাপুরে ছিল। শিল্প বলতে তখন ছিল উত্তর ২৪ পরগণার বীজপুর থেকে বরাহনগর, হুগলীর বালী থেকে ব্যান্ডেল, হাওড়ার চেঙ্গাইল, ফুলেশ্বর, বাউরিয়া। অর্থাৎ কলকাতায় বড়লাটের বাড়িকে কেন্দ্র করে ২৫ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে। ছিল লিলুয়ার রেল শ্রমিকরা, কলকাতায় ছিলেন ট্রাম, বিদ্যুৎ, কর্পোরেশন ও কিছু কারখানার শ্রমিকরা। ১৯২০-২১ সাল থেকেই মুজফফার আহমেদ, আব্দুল হালিম, রেজ্জাকখান, মহঃ ইসমাইল, সোমনাথ

আন্দোলনময় কলকাতার আর এক মুখ

লাহিড়ি, রণেন সেনরা ট্রামকর্মী, কর্পোরেশনের ঝাড়ুদারদের মধ্যে সংগঠন গড়তে থাকেন। বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওইসব প্রতিষ্ঠাতারা যেহেতু কলকাতায় থাকতেন তাই কলকাতাতেই তাদের হাতে গড়া সংগঠনের ভিত পোক্ত ছিল। সমাজে সেসময় মধ্যবিত্তর সংখ্যা খুবই কম ছিল। খোদ কলকাতাতেও তখন মধ্যবিত্ত মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। ১৯২০ ও ১৯৩০ দশক যাওয়ার পর ১৯৪৩ সালে কলকাতায় মধ্যবিত্তদের মধ্যে কমিউনিস্টরা কিছুটা দাগ কাটতে পারেন। তবে মূল কারণ ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ১৯৩০ দশকে গঙ্গার দুধারে চটকল শ্রমিক, বাউরিয়া কটন মিল, কলকাতা কর্পোরেশনে শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব ভালই ছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন কমিউনিস্টদের উদ্বুদ্ধ করল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয় মুম্বাই শহরে। দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় কলকাতায়। সেই কংগ্রেসে সি.পি.আই হঠকারি, রাজনীতির পরিভাষায় যাকে বলে বাম হঠকারি লাইন নেয়। সি. পি. যোশীকে সরিয়ে সাধারণ সম্পাদক হন বি.টি. রনদিভে। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভকে অস্বীকার করে বলা হয়, 'এ আজাদি ঝুঠা হ্যায় ভুলো মাৎ।' ১৯৬৮-৬৯ সালে চারু মজুমদার যে সব কথা বলেছিলেন তা প্রথম বলা হয়েছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে। বলেছিল সি.পি.আই.। কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পার্টি কগ্রেসেই গৃহীত সব রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জেনে সরকার সি.পি.আইকে নিষিদ্ধ করে। প্রথমে করে বাংলায় পরে মুম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে। কেন প্রথম বাংলায় করল, কারণ তখন বাংলায় সামান্য হলেও কমিউনিস্টদের শক্তি বেশি ছিল। মুম্বাইয়ে ডাঙ্গে, রনদিভে, সিরপুরকার ঘাটে, সারদেশাইরা শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা সংগঠন

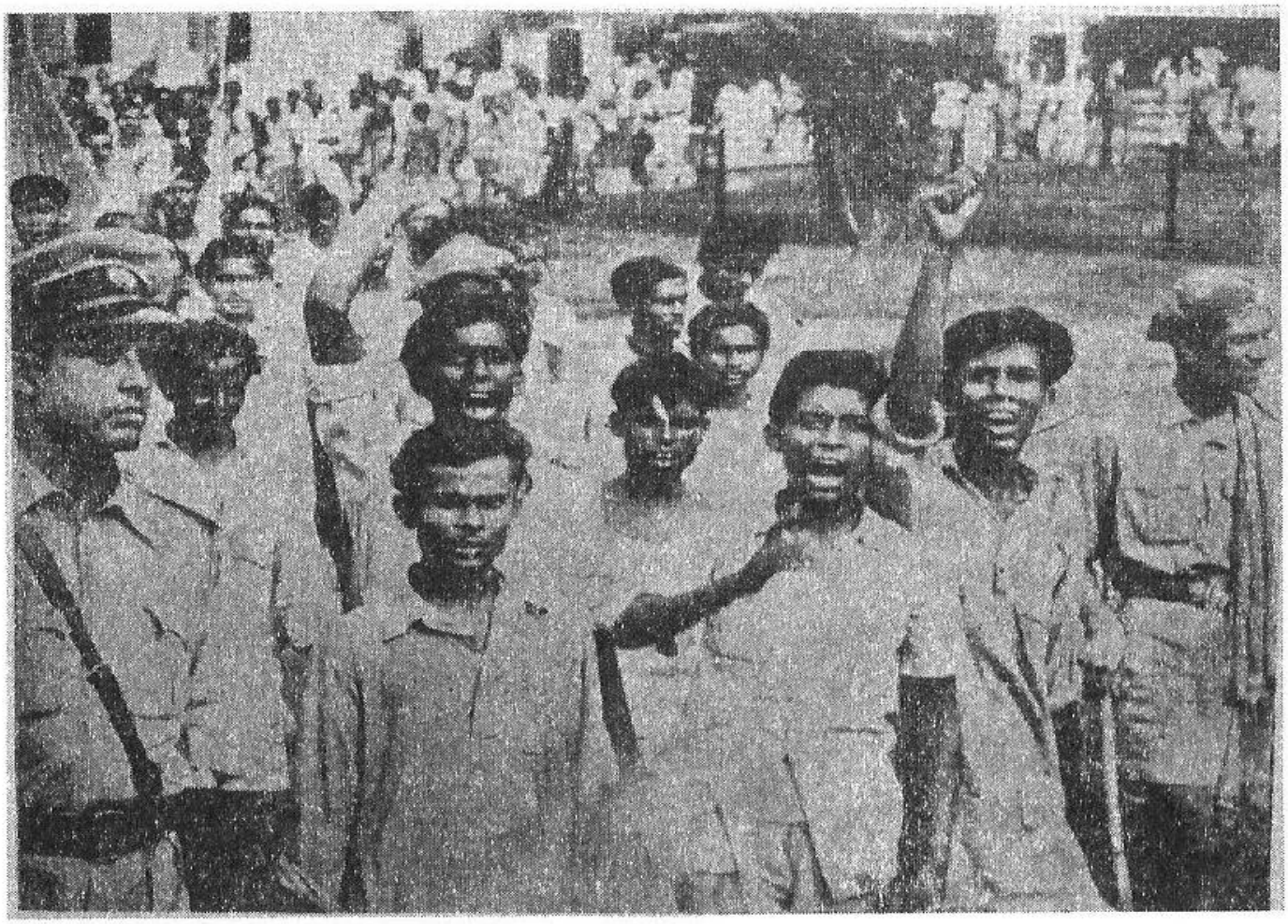

প্রতিবাদে প্রতিরোধে প্রতিশোধে কমরেড
গড়ে তোল গড়ে তোল গড়ে তোল ব্যারিকেড

গড়েছিলেন। মাদ্রাজে নিষিদ্ধ হয়েছিল তেলেঙ্গানা সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের জন্য। তখন অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যেরজন্ম হয়নি। সেটি ছিল মাদ্রাজ প্রদেশে।

১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিবর্তনমূলক আটক আইন চালু করে। সেই আইন বাতিলের দাবিতে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল বের হয়। পুলিশ গুলি চালায়। শিশির মণ্ডল নিহত হন। **স্বাধীনতার পর বাংলার প্রথম শহিদ**। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর পার্টির বহু নেতা ও কর্মীকে বিনাবিচারে আটক করে জেলে ভর্তি করা হয়। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে জেলে সেইসব বন্দীরা রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে অনশন করেন। ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল মধ্য কলকাতার ভারত সভা হলে সি পি আই নিয়ন্ত্রিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রাজবন্দীদের সমর্থনে সভা করেন। সেই সভার পর মিছিল বের হয়। সেই মিছিল বহুবাজার মোড়ে আসা মাত্র কোনও একজন চক্রান্তকারী পুলিশের জিপে বোমা ছোড়ে। পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ৪জন মহিলা লতিকা প্রতিভা অমিয়া গীতা নিহত হন। বহুবাজার মোড়ে ওই চার মহিলা শহিদের নামে বেদি আছে।

বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে

১৯৫০ সালে জ্যোতি বসুর আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট বিচার করে। হাইকোর্ট সি.পি.আইয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। রাজবন্দীরা মুক্ত হন। সি.পি.আই তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে তৃতীয় কংগ্রেস করে। সেটা ১৯৫১ সাল। রনদিভের নৈরাজ্যবাদী হঠকারি লাইন ছেড়ে সি.পি.আই. তখন গণআন্দোলনে জোর দেয়।

১৯৫৩ সালে বৃটিশ মালিকাধীন ট্রাম কোম্পানি ট্রামের ভাড়া দু পয়সা থেকে তিন পয়সা করে। পুরোনো হিসেবের পয়সা। তখন ৬৪ পয়সায় এক টাকা হত। এখন ১০০ পয়সায় হয়। ১৯৫৩ সালে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থীদের আন্দোলন ব্যাপক চেহারা নেয়। সেসময় এক পয়সা হলেও আসলে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি মানুষ কিছুতেই মানতে পারেনি। মনে রাখতে হবে তখন সাবেক কলকাতায় উচ্চবিত্ত ছিলেন হয়ত ৪ শতাংশ, মধ্যবিত্ত ছিলেন হয়ত ৪/৫ শতাংশ, বাকি ৯২/৯৩ শতাংশ মানুষ ছিলেন নিম্নবিত্ত। (এখন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মিলিয়ে ৫০ শতাংশের বেশি। তাই ৫০ পয়সা বাস ভাড়া বৃদ্ধি পেলে মানুষ প্রতিবাদ করে না। মানুষই এখন বলেন কেন মেট্রো রেলের ভাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না? করোনাকালে বলছেন কেন সরকার বাস ভাড়া বাড়াচ্ছে না। মানুষ চান পয়সা একটু বেশি দিয়ে দ্রুত গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য। মানুষের রোজগার বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষ এখন ভোগবাদী হয়েছেন। একারণে বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হয়েছে।

কল্লোল কলকাতার নাটকের চেহারা বদলে দিল
গণ আন্দোলনের সঙ্গী হল

১৯৫৩ সালে এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনের আগে ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ববঙ্গ (তদানীন্তন) থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে কলোনি পত্তন আন্দোলন সংগঠিত করে কমিউনিস্ট পার্টি। তখন জমিদারদের বহু খালি জমি সাবেক কলকাতার চারপাশে ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সেই জমিতে উদ্বাস্তুদের ছিটে বেড়ার ঘর বাঁধতে, কলোনি পত্তন করতে সাহায্য করেন। জমিদারদের গুন্ডারা লাঠি নিয়ে আসে। জমিদারদের কথায় পুলিশ কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের মধ্যে বামপন্থীরা শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলেন। সোমনাথ লাহিড়ি, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অম্বিকা চক্রবর্তী, শচীন সেন (যাদবপুর), প্রশান্ত শূর, মনোজপ্রমিত গাঙ্গুলি প্রমুখ নেতারা তখন উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করতেন। এজন্য ১৯৫২ সালের প্রথম ভোটে টালিগঞ্জ (দক্ষিণ) কেন্দ্রে সি.পি.আই. প্রার্থী অম্বিকা চক্রবর্তী ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জেতেন। কালীঘাটে জেতেন সি.পি.আইয়ের মণিকুন্তলা সেন। উত্তর কলকাতার বিদ্যাসাগর কেন্দ্রে জেতেন সি.পি.আই প্রার্থী ও প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ নারায়ণ রায়। তিনি ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। বেলেঘাটায় জিতেছিলেন মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী। মানিকতলায় জিতেছিলেন সি.পি.আইয়ের রণেন সেন। বেলগাছিয়ায় জিতেছিলেন সি.পি.আই প্রার্থী ও মাষ্টারদা সূর্য সেনের শিষ্য বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, জোড়াসাঁকোয় জিতেছিলেন মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের অমরবসু ও শ্যামপুকুরে ফরওয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু। ১৯৫২ সালের ভোটের ফল

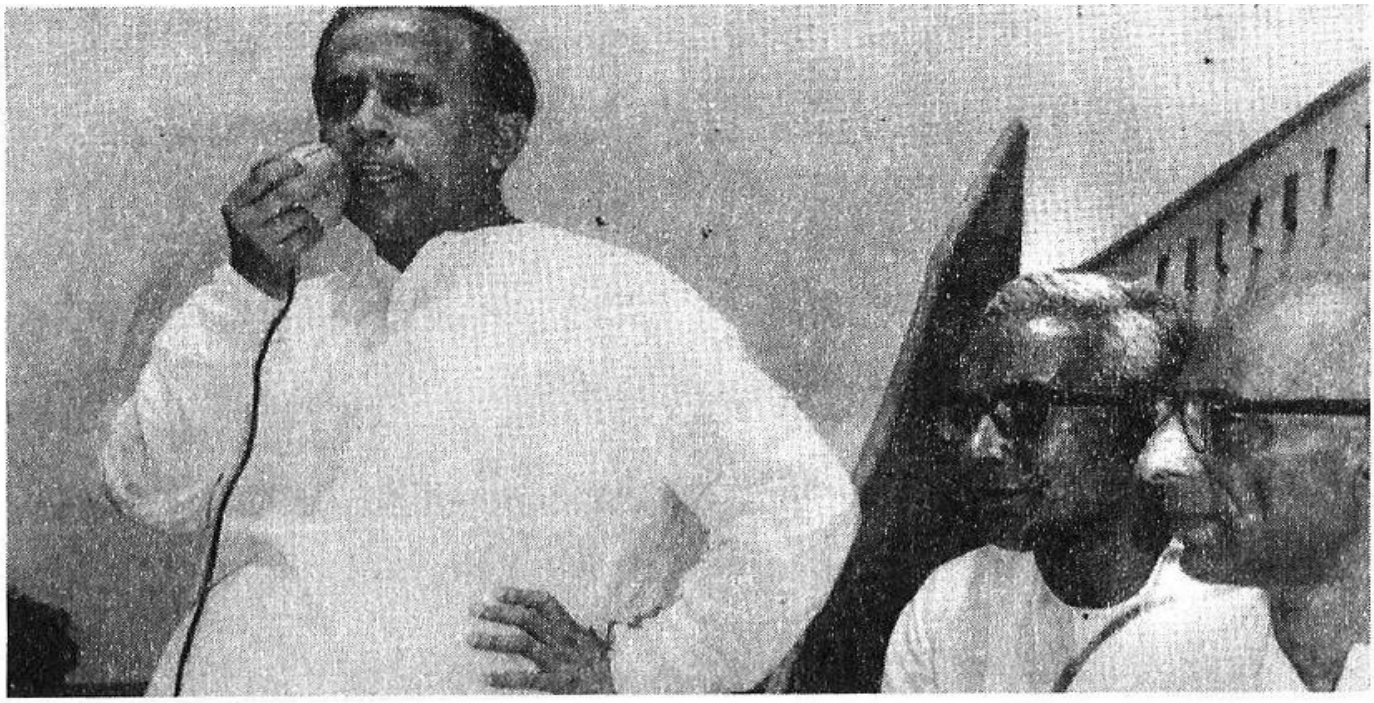

তখন জ্যোতি বসুর ভাষণ শুনতে লড়াকু মানুষের আগ্রহ বাড়ছে

বুঝিয়েছিল কলকাতায় বামপন্থীদের পায়ের তলায় ভিত্তি আছে। ১৯৫২ সালে কলকাতা উত্তরপূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে জিতেছিলেন সি.পি.আইয়ের অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি। তিনি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছিলেন। কলকাতা উত্তরপশ্চিমে জয়ী হন আর এস পি প্রার্থী মেঘনাদ সাহা। তিনি ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। মেঘনাদ সাহা হঠাৎ মারা যান, উপনির্বাচন হয়। উপনির্বাচনেও কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেনকে হারান বামপন্থীদের প্রার্থী মোহিত মৈত্র। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে জয়ী হন জনসঙ্ঘের ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রহস্যজনক মৃত্যু হল কাশ্মীরে। ওই আসনে উপনির্বাচন হয়। উপনির্বাচনে জেতেন সি.পি.আইয়ের সাধন গুপ্ত। পরাস্ত করেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ডঃ রাধাবিনোদ পালকে। কলকাতার বামপন্থীদের সেই ভিত্তি আজ নেই। কারণ ভোটের বিন্যাস পাল্টে গেছে। পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে ভোটারদের চরিত্র ও মনোভাব পাল্টেছে। বামপন্থীরাও নিজেরা সৎ থেকে তাঁদের শ্রেণী সংগ্রামের কর্মসুচী সময়োপযোগী করতে পারেননি।

১৯৫৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা যোশেফ স্তালিন। প্রয়াত হন। তাঁর কফিনের রেপ্লিকা নিয়ে কলকাতায় বেরিয়েছিল বিরাট মিছিল। ১৯৫৩ সালের পর এল ১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন। সেসময় স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের বেতন খুবই কম ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সেসময় শিক্ষকদের নিয়ে আন্দোলন করে। প্রায় ১০০ শতাংশ শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই আন্দোলনে যোগ দেন। ধর্মতলায় সে সময় শিক্ষক সমাবেশে চোঙা হাতে নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন

উদ্বাস্তু আন্দোলনে কম্যুনিস্টদের মতো কেউ পাশে থাকেনি। শহরতলি নয়, শহর কলকাতাতেও কম্যুনিস্টদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে থাকল।

জ্যোতি বসু। বিধানসভাতেও জ্যোতি বসু ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের দাবি দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। ওই আন্দোলনের ফলে শিক্ষকদের মধ্যে বামপন্থীদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৫৬ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মিলে বাংলা ও বিহার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব করেন। বামপন্থীরা এর প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। সে সময় একদিনে কলকাতার ১২টি জায়গায় বড় বড় সভা হয়। সুবক্তা তখন অনেকে ছিল। জ্যোতি বসু, সোমনাথ লাহিড়ি, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিশ্বনাথ মুখার্জি, মণিকুন্তলা সেন, রনেন সেন, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, মহঃ ইসমাইল, রেজ্জাকখান কত নাম বলব, আন্দোলনের তীব্রতা দেখে রাজ্য সরকার শিউরে উঠল। এসময় মেঘনাদ সাহার মৃত্যুতে কলকাতা উত্তর পশ্চিম লোকসভা আসন শূন্য হয়। সেই আসনে উপনির্বাচন হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় বলেন এই উপনির্বাচন হল গণভোট। যদি কংগ্রেস হারে

ইংরেজ দেশ ছাড়ল পুলিশের চরিত্র বদল হল না। শাসক আগের মতোই পুলিশকে ব্যবহার করতে লাগল। লাগাতার

তাহলে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া হবে, ভোট হল। বামপন্থীদের সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মোহিত মৈত্র জয়ী হন। পরাস্ত হন কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেন। বিধানচন্দ্র রায় গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখিয়ে সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেন।

১৯৫৯। জুন মাস থেকেই গ্রাম মফস্‌সল শহর সর্বত্র চালের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। হাহাকার রব ওঠে। গ্রাম থেকে আর্ত মানুষ শহরে এসে ফ্যান দাও ফ্যান দাও বলে দোরেদোরে ঘুরতে থাকেন। বামপন্থীরা তখন গড়েছিলেন 'দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি।' সেই কমিটির ডাকে হয় জোরদার খাদ্য আন্দোলন। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট গ্রাম থেকে হাজার হাজার কৃষক কলকাতায় এসে জড়ো হন ওয়েলিংটন (সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে ওই কমিটির ব্যানারে। তারপর মিছিল বেরিয়ে এসপ্লানেড ইস্টে এখন সিধো কানহু ডহর যায়। হঠাৎ পুলিশ লাঠি পেটা করতে থাকে। ওই কমিটির নেতৃত্ব জানান সেদিন ওখানে আশি জন লাঠির ঘায়ে নিহত হয়েছেন। প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি পরদিন ছাত্র ধর্মঘট ডাকে। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯। ওইদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট থেকে ছাত্রমিছিল বের হয়। মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মুখে আসতেই পুলিশ গুলি চালায়। গুলিতে ওখানেই ছ জন ছাত্র নিহত হন। সেই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই দিকে দিকে মানুষ ক্ষোভে ফুসে উঠলেন। রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদে প্রতিশোধে জনতা ব্যারিকেড গড়ে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করল। জনতা বনাম পুলিশের লড়াই, রাত ৭টায় সরকার ১২টি থানা এলাকায় কার্ফু জারি করল। মিলিটারি নামানো হল। কেন ১৯৫৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতায় বহু এলাকায় কার্ফু জারি হয়েছিল? কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছিল? না। সেদিন

এসপ্ল্যানেড ইস্ট। ১৫ নভেম্বর ১৯৭৩।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে জ্যোতি বসুকেও পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে

সারা কলকাতা গর্জে উঠেছিল আগের দিন কৃষক মিছিলে ও পরের দিন ছাত্র মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল বলে। সেদিন কলকাতার রাস্তায় নেতা-পুলিশ সংঘর্ষ দেখে মনে পড়ে ১৯০৮ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মুম্বইয়ে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের কথা, যা লেনিন উল্লেখ করে বলেন ভারতে শ্রমিক শ্রেণির জাগরণ হচ্ছে।

১৯৬২ সালে চীন ভারতযুদ্ধ হয়। সে বছরের ২১ অক্টোবর চীন সরকার একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। অথচ সেই রাতেই ভারত সরকার সংবিধানের ৩৫২ (ক) ধারা মতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। ওই রাতেই সিপিআইয়ের মধ্যে যাঁরা একটু চীনের সমর্থক ছিলেন তাঁদের ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে। ১৯৬৩ সালে এজন্য শুরু হয়েছিল বন্দী মুক্তি আন্দোলন। সেই বন্দী মুক্তি আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে হয়নি। মফসসলেও তেমন হয়নি। কিন্তু কলকাতার দুর্বার হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবে সত্যজিৎ রায় সহ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি বেরিয়েছিল। সে বছরই রাজ্য সরকার ট্রামের ভাড়া ৭ নয়া পয়সা থেকে ৮ নয়া পয়সা করে। সেই ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে শুরু হওয়া তুমুল ছাত্র আন্দোলন আগুনে যেন ঘি পড়ল। সরকার তখন ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে বলতে গেলে পনেরো দিন অন্তর সাত দিনের

Somnath Hore, Wood Engraving IV, Courtest: Tebhaga, An Artist's Dairy and Sketch Book, Seagull Books

তেভাগা আন্দোলন নিয়ে কম্যুনিস্ট শিল্পী সোমনাথ হোরের স্মরণীয় কাজ

জন্য সব স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিত। স্কুল কলেজ খোলা থাকলেই ছাত্র আন্দোলন হবে। ছাত্র আন্দোলনকে তখন সরকার এমনই ভয় পেত। সরকার মানে কংগ্রেস সরকার। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

এল ১৯৬৬ সাল। ১৯৬৫ সালে সারাদেশে খরা দেখা দেয়। সারা দেশেই তখন সেচ সেবিত কৃষি এলাকার পরিমাণ কম ছিল। স্বাধীনতার ১৮ বছর পর ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে সেচ সেবিত জমি ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ (এখন হয়েছে ৭৩ শতাংশ)। বিপ্লবের পর চীনে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় বসে ১ অক্টোবর ১৯৪৯। ১৬ বছরের মাথায় ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট সরকার চীনে সেচ সেবিত জমির পরিমাণ করে ৬০ শতাংশ। কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সেই পরিমাণ ছিল ১০ শতাংশের কম। ভূমি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লোবত্তর চীনে সেচ এলাকা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হয়েছিল।

সেচ এলাকা কম, ফসলের উৎপাদন কমে গেল। ওদিকে ১৯৫৬ সাল থেকে চালু হওয়া পাবলিক ল ৪৮০ মতে পাঠানো গমের পরিমাণ মার্কিন সরকার কমিয়ে দিল। কারণ কেন্দ্রের লালবাহাদুর শাস্ত্রী সরকার আমেরিকা সরকারের কথামত টাকার দাম কমাতে রাজি হচ্ছিল না। আমেরিকা গমের বদলে মাইলো পাঠাতো। রেশনে তখন প্রায় প্রতিমাসে সাপ্তাহিক বরাদ্দ চাল গমের পরিমাণ ছাঁটাই করত। রেশনে তখন ভোররাত থেকে লাইন পড়ত। সমাজে এবং কলকাতাতেও তখন মধ্যবিত্তের সংখ্যা কম ছিল। বাইরে চাল বিক্রি হত, কিন্তু ৯৫ শতাংশ লোকের সেই চাল কেনার ক্ষমতা ছিল না। সরকার রেশনে পর্যাপ্ত চাল গম দিতে পারছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে তখন কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চাল গমের অপ্রতুলতার সঙ্গে শুরু হল

কেরোসিনের সঙ্কট। তখন মফস্বলে বেশিরভাগ বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতেন কেরোসিনের ল্যাম্পো জ্বেলে। তখন গ্রাম ও মফস্বল বাংলার আওয়াজ উঠল 'এক পোয়া কেরোসিন চাই'। ১৯৬৬ সালে খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে আন্দোলন সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ল। সেসময় উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে নুরুল ইসলাম, কৃষ্ণনগরে আনন্দ হাইত খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে মিছিলে হাঁটার সময় পুলিশের গুলিতে খুন হন। অমনি সারা বাংলায় আন্দোলন তীব্রতর হয়। কলকাতা উত্তাল হয়ে ওঠে। যথারীতি সরকার স্কুল কলেজ সাত দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। কলকাতার আন্দোলন বলতে গিয়ে সেসময়কার কয়েকটি নির্দিষ্ট আন্দোলনের কথা বলতেই হবে। (১)১৯৬৪ সালে জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলন। দক্ষিণ কলকাতার আনোয়ার শা রোডের (যেখানে এখন সাউথ সিটি গড়ে উঠেছে)। দুয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় উষা ফ্যান ও সেলাই মেশিন তৈরি হত। ওই কারখানার সেই আন্দোলন তখন কলকাতা ও আশপাশের শ্রমিক মহল্লাকে নাড়া দিয়েছিল। (২) উৎপল দত্তর নাটক 'কল্লোল'। ১৯৬৪ সালে মিনার্ভায় এই নাটক চলতে দিতে বাধা দেয় শাসকরা। একটা নাটক চলবে কি চলবে না তাই নিয়ে সোরগোল ওঠে। নৌ বিদ্রোহের পটভূমিকায় তৈরি 'কল্লোল' কলকাতার মানুষকে সেসময় বিদ্রোহী করে তুলেছিল। (৩) ১৯৬৬ সালের গোড়ায় পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটা থানায় নিমাই সরকার নামে একজনকে পুলিশ হাজতে পিটিয়ে খুন করা হয়। পুলিশ লকআপে বন্দী হত্যার প্রতিবাদে তখন কলকাতা গর্জে ওঠে। (৪) ১৯৬৬ সালের শেষে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ছ'জন বামপন্থী ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়। সেই বহিষ্কারের প্রতিবাদে গড়ে উঠেছিল তুমুল ছাত্র আন্দোলন। (৫) এইসব ঘটনা কলকাতার মধ্যবিত্তদের আলোড়িত করে। ওইসব আন্দোলনের জেরে ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কলকাতার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে দুটি (কলকাতা দক্ষিণে গণেশ ঘোষ, কলকাতা উত্তর পুর্বে হীরেন মুখার্জি) বামপন্থীরা জেতেন। কলকাতা উত্তর পশ্চিমে জেতেন কংগ্রেসের অশোক সেন। ২০১৯ সালে এই তিনটি আসনেই বামপন্থীদের ভোট ৮-১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সেবার কলকাতার মধ্যে জোড়াবাগান, আলিপুর, রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, বালিগঞ্জ, এন্টালি, বেলেঘাটা (উত্তর), মানিকতলা, বড়তলা, বেলগাছিয়া কেন্দ্রে জিতেছিল বামপন্থীরা। ২৩টির মধ্যে ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছিল বামপন্থীরা। তাও সেবার বামপন্থীরা দুটি ফ্রন্টে লড়েছিল। সংযুক্ত বামফ্রন্ট (ইউ এল এফ) এবং প্রগতিশীল সংযুক্ত ফ্রন্ট (পি ইউ এল এফ)। নতুবা দুটো ভোট যোগ করলে কাশীপুর কবীতীর্থ এই দুটি আসনও বামপন্থীরা জিতত, অর্থাৎ ২৩টির মধ্যে ১৪টি জিতত। ৫৪ বছর পর কলকাতার বামফ্রন্টের কী অবস্থা সবাই দেখছেন।

বাংলায় কংগ্রেসবিরোধী ও বাম আন্দোলনে সবচেয়ে সফল মুখ

তেভাগা আন্দোলন থেকে ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন একটানা কুড়ি বছরের আন্দোলন কলকাতার বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে। বিপরীতে ১৯৯০ সালের পর কুড়ি বছরে রাজনীতি ও আদর্শ বর্জিত চর্চা, সার্থসিদ্ধির আলোচনা ও দাদাগিরি অন্যত্রর সঙ্গে কলকাতাতেও বামফ্রন্ট্রের হাল খারাপ করেছে।

এই লেখার শুরুতেই বলেছি একসময় মনে হয় কলকাতা নেই কলকাতাতেই, আবার পরক্ষণেই মনে হয় কলকাতা আছে কলকাতাতেই। দ্বান্দ্বিকভাবে দেখলে কেউ বলতে পারে ১৯৬৭ সালে আন্দোলনমুখী বামপন্থীরা যেমনি ভোট পেযেছিলো তেমনি ২০০৯, ২০১০, ২০১১ সালে আন্দোলনমুখী তৃণমূল কংগ্রেস ভোট পেযেছে। এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই সময়ে বামপন্থীদের মতই সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম ইস্যুতে কৃষক আন্দোলন করেছে। ১৯৬৮ সালের কলকাতার দুটি ঘটনা সাড়া মিলেছিল। সেসময় স্টেটসম্যান পত্রিকায় অসাংবাদিক কর্মীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল আন্দোলন। সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন স্টেটসম্যানের সাংবাদিকরা। আজ তো এসব ভাবাই যায় না। স্টেটসম্যান কর্মীদের সমর্থনে তখন গেটে এসে সমর্থন জানাত অন্য সংস্থার ইউনিয়ন, যুব ছাত্ররা। ১৯৬৮ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা ভারত সফরে আসেন। তখন ভিয়েতনামের মানুষ দখলদার মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে বীরের মত লড়াই করছিলেন। কলকাতা তখন কেঁপে উঠতো 'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম' শ্লোগানে। ম্যাকনামারা কলকাতা আসবেন শুনেই বামপন্থী যুব ছাত্ররা ঘোষণা করেন ম্যাকনামরাকে কলকাতার মাটিতে পা রাখতে দেব না। সত্যি সেদিন বামপন্থী যুব ছাত্রদের তুমুল জঙ্গি বিক্ষোভ ও 'গো ব্যাক ম্যাকনামরা' শ্লোগানে কলকাতার আকাশবাতাস মুখরিত হয়েছিল। সেদিন ম্যাকনামরার বিমান কলকাতায় নামতে পারেনি। ম্যাকনামরার কলকাতা ঘুরে দেখার শখ সেদিন মেটেনি।